سورة الحديد

সূরা হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ لَهٗ مُلْكُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَ

اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٤ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ

تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٥ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ

ۗ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর, প্রজ্ঞাময়। (২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৪) তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই

থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৫) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু (সৃষ্ট বস্তু) আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে কিংবা অবস্থার মাধ্যমে)। তিনি শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও (তিনিই) মৃত্যু ঘটান। তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তিনিই (সব সৃষ্টের) আদি এবং তিনিই (সবার ধ্বংস হওয়ার পর) অন্ত। (অর্থাৎ তিনি পূর্বে কখনও অনস্তিত্বশীল ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কোনরূপে অনস্তিত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই সবার শেষেও তিনিই)। তিনিই (স্বীয় অস্তিত্বে প্রমাণাদির আলোকে প্রকটভাবে) প্রকাশমান এবং তিনিই (সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে) অপ্রকাশমান। (অর্থাৎ কেউ তাঁর সত্তা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়। যদিও সৃজিতরা একদিক দিয়ে তাঁকে জানে এবং একদিক দিয়ে জানে না, কিন্তু তিনি সব সৃজিতকে সব দিক দিয়ে জানেন)। তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি (এমন সক্ষম যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিন পরিমিত সময়ে) অতঃপর আরশে (যা সিংহাসন সদৃশ, এমনভাবে) সমাসীন (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর পক্ষে শোভনীয়)। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে (যেমন বৃষ্টি) ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় (যেমন উদ্ভিদ) এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয় (যেমন ফেরেশতারা। তাঁরা আকাশে উঠানামা করে ও বিধি-বিধান, যা অবতীর্ণ হয় এবং বান্দার আমল যা উত্থিত হয়। তিনি যেমন এসব বিষয় জানেন, তেমনি তোমাদের সব অবস্থাও তিনি জানেন। সেমতে) তিনি (জ্ঞাত হওয়ার দিক দিয়ে) তোমাদের সাথে থাকেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন? (অর্থাৎ তোমরা কোথাও তাঁর কাছ থেকে গোপন থাকতে পার না)। তোমরা যা কিছু কর, তিনি তা দেখেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সব বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (অর্থাৎ কিয়ামতে পেশ হবে। এভাবে তওহীদের সাথে কিয়ামতও প্রমাণিত হয়ে গেল)। তিনিই রাত্রিকে (অর্থাৎ রাত্রির অংশকে) দিনে প্রবিষ্ট করেন, (ফলে দিন বড় হয়ে যায় এবং) তিনিই দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশকে) রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। (ফলে রাত্রি বড় হয়ে যায়। এই শক্তি-সামর্থ্যের সাথে তাঁর জ্ঞান এমন যে) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سَبَّحَ অথবা يُسَبِّحُ আছে, সেগুলোকে হাদীসে مُسَبِّحَاتٌ তথা তসবীহযুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুম'আ এবং পঞ্চম তাগাবুন আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা

করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর বলেনঃ সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াতঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমু'আ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ও যিকির অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়।---(মাযহারী)

শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও।---(ইবনে কাসীর)

এই আয়াতের তফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই---সবগুলোরই অবকাশ আছে। 'আউয়াল' শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমনঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। এক. যা কার্যত বিলীন হয়ে যায়; যেমন, কিয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। দুই. যা কার্যত বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোযখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহ্র সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গাযালী (র) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহ্র পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহ্র মারেফত।---(রূহুল-মা'আনী)

'যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশ্যমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তি-সামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।

স্বীয় সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা 'বাতেন' তথা অপ্রকাশমান। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনা তাঁর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়। কবি বলেনঃ

اے برتر از قیاس و گمان خیال و وهم -
وز هرچه دیده ایم و شنیده ایم و خوانده ایم
اے برون از جمله قال و قیل من -
خاک بر فرق من و تمثیل من ٥

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাকনা কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ
وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ
لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝
وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ۗ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

(৭) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহ্ তো পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন---যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৯) তিনিই তাঁর দাসের প্রতি প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (১০) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহ্-ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর,, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (১১) কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্কে উত্তম ধার দেবে, এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং (বিশ্বাস করে) যে ধন-সম্পদে তিনি তোমাদেরকে অপরের উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে (তাঁর পথে) ব্যয় কর। (এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই ধন-সম্পদ তোমাদের পূর্বে অন্যের হাতে ছিল এবং এমনিভাবে তোমাদের পর অপরের হাতে চলে যাবে। সুতরাং এটা যখন চিরস্থায়ী সম্পদ নয়, তখন একে প্রয়োজনীয় খাতেও ব্যয় না করে আগলে রাখা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি?) অতএব (এই আদেশ মুতাবিক) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না (এর মধ্যেই রসূলের প্রতি বিশ্বাসও দাখিল আছে)। অথচ (বিশ্বাস স্থাপন করার মজবুত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তা এই যে)

রসূল (যার রিসালত প্রমাণিত) তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি (তাঁরই শিক্ষা মুতাবিক) বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন এবং (দ্বিতীয় কারণ এই যে) স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলে বিশ্বাস স্থাপন করার) অঙ্গীকার নিয়েছেন (এর মোটামুটি প্রতিক্রিয়া তোমাদের স্বভাবেও বিদ্যমান রয়েছে এবং রসূলের আনীত মো'জেযা এবং প্রমাণাদিও তোমাদেরকে এই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। অতএব) যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে চাও, (তবে এসব কারণ যথেষ্ট। নতুবা এছাড়া আর কি কারণের অপেক্ষা করছ ? যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ অতঃপর এই বিষয়বস্তুর আরও ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে)।

(বিশেষ)বান্দা[মুহাম্মদ (সা)]-এর প্রতি প্রকাশ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, (যা তিনিই তার প্রাঞ্জলতা ও বিশেষ অলৌকিকতার কারণে উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে বোঝায় যাতে (সেই বান্দা) তোমাদেরকে (কুফর ও মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (ঈমান ও জ্ঞানের) আলোকে আনয়ন করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (তিনি এমন অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়নকারী তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল। এখন ব্যয় না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছেঃ) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, অথচ (এরও একটা মজবুত কারণ আছে। তা এই যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিশেষে আল্লাহ্রই থেকে যাবে (অর্থাৎ যখন সব মালিক মরে যাবে এবং তিনিই থেকে যাবেন। সুতরাং সব ধন-সম্পদ যখন একদিন ছাড়তেই হবে, তখন খুশীমনে দিলেই তো সওয়াবও হয়। কোন সৃষ্ট জীব নভোমণ্ডলের মালিক নয়, তবুও নভোমণ্ডল উল্লেখ করে সম্ভবত এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি যেমন নভোমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি, তেমনি ভূমণ্ডলও অবশেষে বাহ্যিকভাবে তাঁরই অধিকারে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে তো বর্তমানেও তাঁরই মালিকানাভুক্ত। مُسْتَخْلَفِينَ শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হল। অতঃপর ব্যয়কারীদের মর্যাদার তারতম্য বর্ণিত হচ্ছে। বিশ্বাস স্থাপন করে ব্যয় করা প্রত্যেকের জন্যই সওয়াবের কারণ, কিন্তু এর মধ্যেও তারতম্য আছে। তা এই যে) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে (এবং যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে) তারা (উভয়ই) সমান নয় ; (বরং) তারা মর্যাদায় তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে প্রত্যেককেই আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণের (অর্থাৎ সওয়াবের) ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সব পরিজ্ঞাত

আছেন। (তাই উভয় সময়ের কর্মের জন্য সওয়াব দেবেন। অতএব যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করার সুযোগ পায়নি, আমি তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলি ঃ) কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে উত্তম (অর্থাৎ আন্তরিকতা সহকারে) ধার দেবে! এরপরও আল্লাহ্ একে (অর্থাৎ প্রদত্ত সওয়াবকে) তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং (বহুগুণে বৃদ্ধি করার পরও) তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। ('বহুগুণে' বলে পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং كَرِيْم বলে এর মানগত উৎকর্ষের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ——এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা এ কথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কোরআন পাকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى বলে এই অঙ্গী-কারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী পয়-গম্বরগণও তাঁদের উম্মতের কাছ থেকে শেষ নবী (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে ঃ

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ إِصْرِيْ - قَالُوْا أَقْرَرْنَا - قَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ۝

إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ——অর্থাৎ যদি তোমরা মু'মিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে 'তোমরা যদি মু'মিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে?

জওয়াব এই যে, কাফির ও মুশরিকরাও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দাবী করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই ঃ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى

زُلْفَى اللهِ ---অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দাবী যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও কর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ — مِيرَاثُ অভিধানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক ---মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيرَاثُ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশত কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বতোভাবে আল্লাহ্রই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহ্র নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্য রাখলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে ? আমি আরয করলাম ঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহ্র পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহ্র কাছে তোমার জন্য থেকে যাবে। যে হাতটি নিজে খাওয়ার জন্য রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে।---(মাযহারী)

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেওয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে ঃ لَا يَسْتَوِي

مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ---অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে, দুই. যারা মক্কা বিজয়ের পর মু'মিন হয়ে আল্লাহ্র পথে

ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জিহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী।

মক্কা বিজয়েকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্য : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং দুই. যারা মক্কা বিজয়ের পর এ কাজে শরীক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী।

মক্কা বিজয়কে উভয় শ্রেণীর মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি করার এক বড় রহস্য তো এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের টিকে থাকা ও বিলীন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে একই রূপ ছিল। যারা হুঁশিয়ার ও চালাক, তারা এমন কোন দলে অথবা আন্দোলনে যোগদান করে না, যার পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা সামনে থাকে। তারা পরিণামের অপেক্ষায় থাকে। যখন সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই তারা তড়িঘড়ি তাতে যোগদান করে। কিছুসংখ্যক লোক আন্দোলনকে সত্য ও ন্যায়ানুগ বিশ্বাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্যাতনের ভয়ে ও নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাতে যোগ-দান করতে সাহসী হয় না। অপরপক্ষে যারা অসম সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারা কোন মতবাদ ও বিশ্বাসকে সত্য এবং বিশুদ্ধ মনে করলে জয় ও পরাজয় এবং দলের সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যা-ল্পতা, শক্তিহীনতা ও মুশরিকদের নির্যাতনের এক জাজ্বল্যমান ইতিহাস ছিল। বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করা জীবনের ঝুঁকি নেওয়া এবং বাস্তু-ভিটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর ছিল। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহায্য এবং ইসলামের সেবায় জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে তাদের ঈমানী শক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা চলে কি ?

আস্তে আস্তে পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে মক্কা বিজিত হয়ে সমগ্র আরবের উপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। তখন কোরআন পাকের ভাষায় দলে দলে লোকজন এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে (يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا) কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তাদেরকে কল্যাণ তথা ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে একথা বলে দিয়েছে যে, তাদের মর্যাদা পূর্ববর্তীদের সমান হতে পারে না। কারণ

তারা অসম সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তির কারণে বিরোধিতা ও নির্যাতন আশংকার উর্ধ্বে উঠে ইসলাম ঘোষণা করেছে এবং বিপদমুহূর্তে ইসলামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তি পরিমাপ করার জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই উভয় শ্রেণী সমান হতে পারে না।

সকল সাহাবীর জন্য মাগফিরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবশিষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে ঃ وكلا وعد الله الحسنى — অর্থাৎ পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফিরাতের ওয়াদা সবার জন্যই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কিরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্য, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কিরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র পথে কিছুই ব্যয় করেন নি এবং ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় অংশগ্রহণ করেন নি। তাই মাগফিরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

ইবনে হাযম (র) বলেন ঃ এর সাথে সূরা আম্বিয়ার অপর একটি আয়াতকে মিলাও, যাতে বলা হয়েছে ঃ

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ۝
لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون ۝

অর্থাৎ যাদের জন্য আমি পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিয়েছি, তারা জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। জাহান্নামের কষ্টদায়ক আওয়াজও তাদের কানে পৌঁছবে না। তারা পছন্দমত অবদানে চিরকাল বসবাস করবে।

আলোচ্য আয়াতে وكلا وعد الله الحسنى বলা হয়েছে এবং সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতে যাদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করা হয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কোরআন পাক এই নিশ্চয়তা দেয়—পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ যদি সারা জীবনে কোন গোনাহ্ করেও ফেলেন, তবে তিনি তার উপর কায়েম থাকবেন না—তওবা করে নেবেন। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (স)-র সংসর্গ, সাহায্য, ধর্মের মহান সেবামূলক কার্যক্রম এবং তাঁর অসংখ্য পুণ্যের খাতিরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। গোনাহ্ মাফ হয়ে পূত-পবিত্র

হওয়া অথবা পার্থিব বিপদাপদ ও বেশীর বেশী কোন কষ্টের মাধ্যমে গোনাহের কাফফারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটবে না।

কতক হাদীসে কোন কোন সাহাবীর মৃত্যুর পর আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আযাব পরকাল ও জাহান্নামের আযাব নয়; বরং বরযখ তথা কবর-জগতের আযাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোন সাহাবী কোন গোনাহ্ করে ঘটনাচক্রে তওবা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-জগতের আযাব দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আযাব ভোগ করতে না হয়।

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়—ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয়ঃ সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মতের মাঝখানে আল্লাহ্র তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষা পৌঁছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সত্য-মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয়; বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোন পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তদ্দ্বারা তাঁরা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ্ হয়েই যায়, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মুকাবিলায় শূন্যের কোটায় থাকে। দ্বিতীয়ত তাঁরা ছিলেন অসাধারণ আল্লাহ্-ভীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবূল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মাগফিরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগ-ফিরাতই নয়, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি অনুযায়ী অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা ও গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য বর্ণনার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোক সাহাবায়ে কিরামকে দোষারোপের শিকারে পরিণত করছে। প্রথমত যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এসব লিখছেন, সেগুলোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল। যদি কোন পর্যায়ে তাদের

সেসব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মেনেও নেওয়া যায়, তবে কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার মুকাবিলায় তার কোন মর্যাদা নেই। কেননা, কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম সবাই ক্ষমাযোগ্য।

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাস ঃ সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরে ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ওয়াজিব। তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা এবং যে কোন এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত না করা জরুরী। আকায়েদের সকল কিতাবে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে। ইমাম আহ্‌মদের এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে ঃ

لا يجوز لا حد ا ن يذ كر شيئا من مسا بهم و لا يطعن على احد منهم
بعيب و لا نقص فمن فعل ذالک وجب تا د يبه -

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের কোন দোষ বর্ণনা করা অথবা তাঁদের কাউকে দোষী ও ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করা কারও জন্য বৈধ নয়। কেউ এরূপ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব।---(শরহুল আকিদাতিল ওয়াসেতিয়্যা, ৩৮৯ পৃঃ)

ইবনে তাইমিয়া 'ছারেমুল মসলুল' গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর বলেন ঃ

وهذا مما لا نعلم فيه خلا فا بين اهل الفقه و ا لعلم من ا صحا ب
رسول الله صلى الله عليه وسلم و التا بعين لهم با حسا ن و سا ئرا هل
السنة و الجما عة فا نهم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم و الاستغفار
لهم و الترحم عليهم و الترا ضى عنهم و ا عتقا د محبتهم وموا لا تهم
و عقو بة من ا سا ء فيهم القول -

অর্থাৎ আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে আলিম, ফিকহ্‌বিদ, সাহাবী, তাবেয়ী ও আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সবাই একমত যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহ্‌র রহমত ও সন্তুষ্টিবাক্য উচ্চারণ সহকারে তাঁদের উল্লেখ করা এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত ও সহৃদয়তার মনোভাব পোষণ করা সকলের জন্য ওয়াজিব। তাঁদের ব্যাপারে কেউ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

ইবনে তাইমিয়া ''শরহে আকিদায়ে ওয়াসেতিয়্যা' গ্রন্থে সমগ্র উম্মত তথা আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে লিখেন ঃ

و يمسكو ن عما شجر بين الصحا بة و يقو لون هذه الا ثا ر المر و ية
فى مسا ويهم منها ما هو كذ ب و منها ما زيد فيها و نقص و غير و جهه

والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون - وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم -

অর্থাৎ আহ্‌লে-সুন্নত ওয়াল জামা'আত সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ ব্যাপারাদিতে নিশ্চুপ থাকেন। তাঁরা বলেন ঃ যেসব রেওয়ায়েত থেকে তাঁদের মধ্যকার কারোও দোষ বোঝা যায়, সেগুলোর কতক সম্পূর্ণ মিথ্যা, কতক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত এবং যেগুলো সহীহ্ ও বিশুদ্ধ, সেগুলোর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ক্ষমার্হ। কেননা, তাঁরা যা কিছু করেছেন, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। এই ইজতিহাদে হয় তাঁরা অভ্রান্ত ছিলেন (তাহলে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী ছিলেন) না হয় ভ্রান্ত ছিলেন। (এমতাবস্থায়ও ক্ষমার্হ ও এক সওয়াবের অধিকারী ছিলেন)। এসব সত্ত্বেও আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন না যে, প্রত্যেক সাহাবী সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকে মুক্ত ; বরং তাঁদের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁদের গুণ-গরিমা ও ইসলামের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষামূলক কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যেতে পারে; এমনকি তাঁদের এমন সব গোনাহ্ও মাফ হতে পারে, যা উম্মতের পরবর্তী লোকদের মাফ হবে না।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمٰنِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ
فِيهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالْمُنٰفِقٰتُ
لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا
وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ
الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ
الْأَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ

مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ
مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ
الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

(১২) সেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (১৩) সেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে ঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। (১৪) তারা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজে-দেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহ্‌র আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। (১৫) অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার

সময় আসেনি ? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (১৭) তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ই ভূভাগকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্য আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (১৮) নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহ্কে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (১৯) আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফির ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সেদিনও স্মরণীয়) যে দিন আপনি মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখভাগে ও ডান পার্শ্বে ছুটোছুটি করবে। (পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য এই জ্যোতি তাদের সাথে থাকবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, বাম পার্শ্বেও থাকবে। বিশেষভাবে ডান পার্শ্ব উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এদিককার জ্যোতি অধিক উজ্জ্বল হবে এবং এটা আলামত হবে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়ার। সম্মুখভাগে জ্যোতি থাকা এরূপ স্থলে সাধারণ রীতি। তাদেরকে বলা হবে ঃ) আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য (বাহ্যত এই শেষোক্ত বাক্যটিও তখনই বলা হবে। এখন সংবাদ হিসাবে বলা হয়েছে ঃ بُشْرٰى لَكُمْ কথাটি সম্ভবত ফেরেশতাগণ বলবে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَنْ لَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন। এটা সেদিন) যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুসলমানদেরকে (পুলসিরাতে) বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য (একটু) অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের জ্যোতি থেকে একটু আলো নেব। (এটা তখন হবে, যখন মুসলমান ঈমান ও আমলের কল্যাণে অনেক অগ্রে চলে যাবে এবং মুনাফিকরা পুলসিরাতের উপর পেছনে অন্ধকারে থেকে যাবে। তাদের কাছে পূর্ব থেকেই জ্যোতি থাকবে না, কিংবা দুররে-মনসূরের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের কাছেও কিছুটা জ্যোতি থাকবে, কিন্তু তা নির্বাপিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে বাহ্যিক কাজ-কর্মে তারা মুসলমানদের সাথে থাকত, এ কারণে তাদেরকে কিছুটা জ্যোতি দেওয়া হবে। কিন্তু অন্তরে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে আলাদা থাকত, এ কারণে তাদের জ্যোতি বিলীন হয়ে যাবে। এছাড়া তাদের প্রতারণার শাস্তিও তাই যে, প্রথমে জ্যোতি পাবে ও পরে

তা বিলীন হয়ে যাবে)। তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হবে ঃ (হয় ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবে, না হয় মু'মিনগণ) তোমরা পেছনে ফিরে যাও ও (সেখানে) আলোর সন্ধান কর। (পেছনে বলে সেই স্থান বোঝানো হয়েছে যেখানে ভীষণ অন্ধকারের পর পুলসিরাতে আরোহণ করার সময় জ্যোতি বন্টন করা হয়েছিল। অর্থাৎ যেখানে জ্যোতি বন্টন করা হয় সেখানে চলে যাও। সেমতে তারা সেখানে যাবে এবং কিছু না পেয়ে আবার এখানে আসবে)। অতঃপর (মুসলমানদের কাছে পৌঁছতে পারবে না বরং) উভয় দলের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে, যার একটি দরজা (ও) হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে আযাব। (দুররে মনসূরের বর্ণনা অনুযায়ী এটাই আ'রাফের প্রাচীর। অভ্যন্তর ভাগ মু'মিনদের দিকে এবং বহির্ভাগ কাফিরদের দিকে থাকবে। রহমতের অর্থ জান্নাত এবং আযাবের অর্থ জাহান্নাম। দরজাটি সম্ভবত কথাবার্তা বলার জন্য হবে অথবা এটাই হবে জান্নাতের পথ। মোটকথা, যখন তাদের ও মুসলমানদের মাঝখানে প্রাচীর স্থাপিত হবে এবং তারা অন্ধকারে থেকে যাবে, তখন) তারা মুসলমানদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? (অর্থাৎ কাজেকর্মে ও ইবাদতে তোমাদের সাথে শরীক ছিলাম। অতএব আজও সঙ্গে থাকা উচিত)। তারা (মুসলমানরা) বলবে ঃ হ্যাঁ (ছিলে) কিন্তু (এরূপ থাকা কোন্ কাজের? তোমরা কেবল দৃশ্যত আমাদের সাথে ছিলে। তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল এই যে) তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিলে (তোমরা পয়গম্বর ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে এবং তাদের উপর বিপদাপদ আসার) প্রতীক্ষা করেছিলে, (ইসলামের সত্যতায়) সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, অবশেষে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আদেশ পৌঁছে গেছে। (মিথ্যা আশা এই যে, ইসলাম মিটে যাবে, আমাদের ধর্ম সত্য ও মুক্তিদাতা ইত্যাদি। 'আল্লাহ্‌র আদেশ' মানে মৃত্যু। অর্থাৎ সারাজীবন এসব কুফরীতেই লিপ্ত ছিলে, তওবাও করনি)। মহাপ্রতারক (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল। (একথা বলে যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। সারকথা এই যে, এসব কুফরীর কারণে তোমাদের বাহ্যত সঙ্গে থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়)। অতএব আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নয়। (প্রথমত মুক্তিপণ দেওয়ার মত বস্তু তোমাদের কাছে নেই, যদি থাকত তবুও গ্রহণ করা হত না। কেননা এটা প্রতিদান জগৎ---কর্মজগৎ নয়)। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের (চির) সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল! (فاليوم الخ কথাটি হয় মু'মিনদের না হয় আল্লাহ্ তা'আলার। এই পুরোপুরি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ঈমানে প্রয়োজনীয় ইবাদতের অভাব আছে, তা পূর্ণ নয়। তাই পরবর্তী আয়াতে ঈমান পূর্ণ করার জন্য শাসানোর ভঙ্গিতে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হচ্ছে ঃ) যারা মু'মিন, তাদের (মধ্যে যারা প্রয়োজনীয় ইবাদতে ত্রুটি করে ; যেমন গোনাহ্‌গার মুসলমান তাদের) জন্য কি (এখনও) আল্লাহ্‌র উপদেশের এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার সামনে হৃদয়-বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? (অর্থাৎ তাদের

মনেপ্রাণে জরুরী ইবাদত পালনে এবং গোনাহ্ বর্জনে কৃতসংকল্প হওয়া উচিত)। তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে (ঐশী) কিতাব দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের মত। তারাও তাদের কিতাবের দাবীর বিপক্ষে খেয়াল-খুশী ও গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল)। অতঃপর তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয় (এবং তওবা করেনি)। ফলে তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে যায়। (ভুলক্রমেও তারা অনুতাপ করত না। অন্তরের এই কঠোরতার কারণে আজ) তাদের অধিকাংশই কাফির (কারণ, সদাসর্বদা গোনাহে লেগে থাকা, গোনাহ্‌কে ভাল মনে করা, সত্য নবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করা, এসব বিষয় প্রায়ই কুফরের কারণ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের শীঘ্রই তওবা করা উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে পরে তওবা করার তওফীক হয় না এবং মাঝে মাঝে তা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের অন্তরে গোনাহের কারণে কোন অনিষ্ট সৃষ্টি হয়ে থাকলে এই ধারণাবশত তওবা থেকে বিরত থেকো না যে, এখন তওবা করলে কি ফায়দা হবে? বরং তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলাই মাটিকে শুকিয়ে যাওয়ার পর সবুজ-সতেজ করেন। (এমনিভাবে তওবা করলে স্বীয় অনুগ্রহে মৃত অন্তরকে তিনি জীবিত করে দেন। অতএব নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা) আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (অতঃপর পূর্বোল্লিখিত ব্যয়ের ফযীলত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী যারা আল্লাহ্‌কে আন্তরিকতা সহকারে ধার দেয়, তাদের দান তাদের জন্য (সওয়াবের দিক দিয়ে) বহুগুণে বাড়ানো হবে এবং (এরপরও) তাদের জন্য রয়েছে পছন্দনীয় পুরস্কার। (অতঃপর উল্লিখিত ঈমানের ফযীলত বলা হচ্ছে) ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ। (অর্থাৎ পূর্ণত্বের এসব স্তর পূর্ণ ঈমান দ্বারাই অর্জিত হয়। শহীদ তাকে বলা হয়, যে নিজের প্রাণকে আল্লাহ্‌র পথে পেশ করে দেয় যদিও নিহত না হয়। কারণ, নিহত হওয়া ইচ্ছা বহির্ভূত কাজ। তাদের জন্য জান্নাতে) রয়েছে তাদের (উপযুক্ত বিশেষ) পুরস্কার এবং (পুলসিরাতে রয়েছে বিশেষ) জ্যোতি। আর যারা কাফির ও আমার আয়াত অস্বীকারকারী, তারাই জাহান্নামী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

অর্থাৎ সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি নাতিদীর্ঘ। এতে আছে যে, আবূ উমামা (রা) একদিন দামেশ্‌কে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে

মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া হল ঃ

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সব মু'মিন ও কাফিরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দেওয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মু'মিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেওয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে ; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। ---(ইবনে কাসীর)

অতঃপর হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কোরআন পাক এই ঘটনা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছে ঃ

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ـ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ـ

তিনি আরও বলেন, মু'মিনদেরকে যে নূর দেওয়া হবে, তা দুনিয়ার নূরের মত হবে না। দুনিয়ার নূর দ্বারা আশেপাশের লোকেরাও আলো লাভ করতে পারে। অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখের জ্যোতি দ্বারা দেখতে পারে না তেমনি মু'মিনের নূর দ্বারা কোন কাফির ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না।---(ইবনে কাসীর)

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা)-র এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, যে মনযিলে গভীর অন্ধকারের পর নূর বণ্টন করা হবে, সেই মনযিল থেকেই কাফির মুনাফিকরা নূর থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কোন প্রকার নূর পাবেই না।

কিন্তু তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

পুলসিরাতের নিকটে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দান করবেন এবং প্রত্যেক মুনাফিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌঁছা মাত্রই মুনাফিকদের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে।---(ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকদেরকেও প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুল-সিরাতে পৌঁছার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যাই হোক, মুনাফিকরা তখন মু'মিনগণকে অনুরোধ করবে---একটু আস, আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা একটু উপকৃত হই। কারণ, দুনিয়াতেও নামায, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের অংশীদার ছিলাম। তাদের এই অনুরোধের নেতিবাচক জওয়াব দেওয়া হবে, যা পরে বর্ণিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টায়ই লেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে তদ্রূপ ব্যবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কোরআন পাক বলেঃ يُخَادِعُونَ

اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ধোঁকা দেন। ইমাম বগভী বলেনঃ এই ধোঁকার অর্থ তাই যে, প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে, এরপর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মু'মিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে। তাই তারা শেষ-পর্যন্ত নূর বহাল রাখার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এর উল্লেখ আছেঃ

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ

اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا ـ

মুসলিম, আহমদ ও দারে-কুতনীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র বর্ণিত হাদীসেও বলা হয়েছেঃ প্রথমে মু'মিন ও মুনাফিক---উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুলসিরাতে পৌঁছে মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফিরদের ন্যায় নূর পাবে না। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পরও এই উম্মতে মুনাফিক হবে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাদেরকে 'মুনাফিক' নাম দেওয়া যাবে না। অকাট্য ওহী ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উম্মতের কারও নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জানেন কার অন্তরে ঈমান আছে এবং কার অন্তরে নেই। অতএব আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যারা মুনাফিক হবে, তাদেরকে প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

এই উম্মতে এ ধরনের মুনাফিক তারা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে ।---(নাউযুবিল্লাহি মিনহু)

হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে ঃ তফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকারের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল ঃ

১. আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা)-র রেওয়ায়েতে এবং ইবনে মাজা বর্ণিত হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই বিষয়বস্তুরই রেওয়ায়েত হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ, যায়দ ইবনে হারেসা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবূ উমামা, আবূদ্দারদা, আবূ সাঈদ, আবূ মূসা, আবূ হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে।

২. মসনদে আহমদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من حافظ على الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামায যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই নামায তার জন্য নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নামায আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। সে কারূন, হামান ও ফিরাউনের সাথে থাকবে।

৩. তিবরানী বর্ণিত আবূ সায়ীদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য মক্কা মোকাররমা পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে---যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের একটি আয়াতও তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্য নূর হবে।---(মসনদে আহমদ)

৫. দায়লামী বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার প্রতি দরূদ পাঠ পুলসিরাতে নূরের কারণ হবে।

৬. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হজ্জের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ হজ্জ ও ওমরার ইহ্রাম খোলার জন্য যে মাথা মুণ্ডন করা হয়, তাতে মাটিতে পতিত কেশ কিয়ামতের দিন নূর হবে।---(তিবরানী)

৭. হযরত ইবনে মসউদ (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, মিনায় কংকর নিক্ষেপ কিয়ামতের দিন নূর হবে।---(মসনদে-বাযযার)

৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সেই চুল তার জন্য নূর হবে।---(তিরমিযী)

৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে একটি তীরও নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন সেই তীর তার জন্য নূর হবে।---(বাযযার)

১০. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহ্‌র যিকির করে, সে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন একটি নূর পাবে।----(বায়হাকী)

১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ ও কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য পুলসিরাতে নূরের দু'টি শাখা করে দেবেন, তদ্দ্বারা এক জাহান আলোকিত হয়ে যাবে।---(তিবরানী)

১২. বুখারী ও মুসলিম ইবনে ওমর (রা) থেকে, মুসলিম হযরত জাবের (রা) থেকে, হাকেম হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং তিবরানী ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, اياكم والظلم فانه هو الظلمات يوم القيامة অর্থাৎ তোমরা জুলুম ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাক। জুলুমই কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ লাভ করবে।

نعوذ بالله من الظلمات ونسأله النور التام يوم القيامة

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ—অর্থাৎ যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে ঃ আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা উপকৃত হই।

قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا— অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে ঃ যেখানে নূর বন্টন হয়েছিল, সেখানে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর। এ কথা মু'মিনগণ বলবে অথবা ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবে।

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ

الْعَذَابُ—অর্থাৎ মু'মিন অথবা ফেরেশতাগণের জওয়াব শুনে মুনাফিকরা সে স্থানে ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মু'মিনগণের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তাদের ও মু'মিনগণের মাঝখানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাগে মু'মিনদের জায়গায় থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে মুনাফিক-দের জায়গায় থাকবে আযাব।

রূহুল-মা'আনীতে ইবনে যায়েদ (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, এটা হবে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যবর্তী আ'রাফের প্রাচীর। অপর কয়েকজনের মতে এটা ভিন্ন প্রাচীর হবে। এতে যে দরজা থাকবে, এটা হয় মু'মিন ও কাফিরদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলার জন্য, না হয় মু'মিনগণ এই দরজা দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নূরের ব্যাপারে কোরআনে কাফিরদের কোন উল্লেখই হয়নি। কারণ তাদের নূর পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। মুনাফিকদের নূর সম্পর্কে দ্বিবিধ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম থেকেই তারা নূর পাবে না কিংবা পাওয়ার পর পুলসিরাতে উঠতেই নিভিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের ও মু'মিনদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে। এই সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, শুধু মু'মিনগণই পুলসিরাত দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করবে। কাফির ও মুশরিকরা পুলসিরাতে উঠবে না। তাদেরকে জাহান্নামের প্রবেশপথ দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মু'মিনগণ পুলসিরাতের পথ অতিক্রম করবে। পাপী মু'মিনগণকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ কিছু দিন জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। তারা পুলসিরাত থেকে নিম্নে পতিত হয়ে জাহান্নামে পৌঁছবে। অন্যান্য মু'মিন নিরাপদে পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।---(শাহ্ আঃ কাদের দেহলভী)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ—অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

خشوع قلب--এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবূল করা ও আনুগত্য করা।---(ইবনে কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া।---(রূহুল-মা'আনী)

এটা মু'মিনদের জন্য হুঁশিয়ারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন মু'মিনের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ

করে এই আয়াত নাযিল করেন।---(ইবনে কাসীর) ইমাম আ'মাশ বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।---(রূহুল-মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুঁশিয়ারি সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই হুঁশিয়ারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ-কর্মের জন্য তৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎ কর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেওয়া হবে।---(ইবনে কাসীর)

প্রত্যেক মু'মিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ্ ও আমর ইবনে মায়মূন (রা) বলেন, যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দীক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ مؤمنوا متى شهداء অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মু'মিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।---(ইবনে জরীর)

একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ كلكم صديق وشهيد অর্থাৎ আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ আবু হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ —

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মু'মিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মু'মিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই ঃ

أُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ -

এই আয়াতে পয়গম্বরগণের সাথে মু'মিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা---সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্। বাহ্যত এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণ-গরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মু'মিনকেও কোন-না-কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রূহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামিল ও ইবাদতকারী মু'মিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুনা যেসব মু'মিন অনবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ اللعانون لا يكونون شهداء অর্থাৎ যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রা) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন ঃ তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইয্যতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না ? জনতা আরয করল ঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইয্যতের উপর হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মুকাবিলায় সাক্ষ্য দেবে।—(রূহুল-মা'আনী)

তফসীরে মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيقُونَ বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে কিরামই সিদ্দীক, অন্য কোন মু'মিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম সকলেই পয়গম্বরসুলভ গুণ-গরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মু'মিন অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণ-গরিমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

اِعْلَمُوٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ

نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

(২০) তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীত বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ বৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহান কৃপার অধিকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

জেনে রাখ, (পরকালের মুকাবিলায়) পার্থিব জীবন (কিছুতেই কাম্য হবার যোগ্য নয়। কেননা, এটা নিছক) ক্রীড়া-কৌতুক, (বাহ্যিক) সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা (অর্থাৎ শক্তি, সৌন্দর্য ও কলাকৌশল নিয়ে) এবং ধনে ও জনে পারস্পরিক প্রাচুর্য লাভের প্রয়াস ব্যতীত কিছু নয়। (অর্থাৎ পার্থিব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এইঃ শৈশবে ক্রীড়া-কৌতুক, যৌবনে জাঁকজমক ও অহমিকা এবং বার্ধক্যে ধন ও জনের প্রবল বড়াই থাকে। এসব উদ্দেশ্য ধ্বংসশীল ও কল্পনা বিশ্বাস মাত্র। এর দৃষ্টান্ত এরূপ) যেমন বৃষ্টি (বর্ষিত হয়), যার বদৌলতে উৎপন্ন ফসল কৃষককে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুষ্ক হয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীত বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। (এমনিভাবে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, এরপর পতন ও অনুশোচনা মাত্র। পক্ষান্তরে) পরকালে আছে (দুটি বিষয়, একটি কাফিরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (অপরটি মু'মিনদের জন্য) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। (এই উভয় বিষয় চিরস্থায়ী। সুতরাং পরকাল চিরস্থায়ী এবং)

পার্থিব জীবন নিছক (ধ্বংসশীল, যেমন মনে করে) প্রতারণার সামগ্রী। (সুতরাং পার্থিব সম্পদ যখন ধ্বংসশীল এবং পরকালের ধন চিরস্থায়ী, তখন তোমাদের উচিত) তোমাদের পালনকর্তার দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান (অর্থাৎ এর চাইতে কম নয়, বেশী হতে পারে) এটা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটা অর্থাৎ ক্ষমা ও সন্তুষ্টি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (এতে ইঙ্গিত আছে যে, কেউ যেন নিজ আমলের কারণে গর্বিত না হয় এবং জান্নাত দাবী না করে বসে। জান্নাত নিছক আমার অনুগ্রহ, যা লাভ করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমি নিজ কৃপায় যারা এসব আমল করে, তাদের সাথে আমার ইচ্ছাকে জড়িত করেছি। ইচ্ছা না করাও আমার ক্ষমতাধীন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের জন্য পরকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাবে গ্রেফতার হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই ঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজসজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

لعب শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। لهو এমন খেলাধূলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময় ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لعب এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لهو শুরু হয়, এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলাধূলাকে জীবনের সম্পদ ও সর্ববৃহৎ ধন মনে করে। কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে

তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধনসম্পদ, কুঠি, বাংলো ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পরে তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থ-হীন বস্তু। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনযিল। এ মনযিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁকজমক ও পদের জন্য গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর বরযখ ও কিয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কোরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে ঃ

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا

غَيْثٍ—শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كُفَّار শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীর-বিদ كُفَّار শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফিররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কাফিররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসল-মানরাও হয়। জওয়াব এই যে, মু'মিনের আনন্দ ও কাফিরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মু'মিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহ্র কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মু'মিন কাফিরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফির আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফিররা খুবই আন-ন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য---পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ অর্থাৎ পরকালে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফিরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মু'মিনদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া নিয়ে মাতাল ও উদ্ধত হওয়ার পরিণামও কঠোর আযাব। কঠোর আযাবের বিপরীতে দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই হয় না; বরং আযাব থেকে বাঁচার পর মানুষ জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত দ্বারাও ভূষিত হয়। এটা রিযওয়ান তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে : وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ — অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে :

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ভরসা নেই; অতএব সৎ কাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোন রোগ অথবা ওযর তোমার সৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎ কাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎ কাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রা) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেন : তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন : জিহাদে

সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ জামা'আতের নামাযে প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর।---(রূহুল-মা'আনী)

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্র করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ঐ পৃথিবীর আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী--عرض শব্দটি কোন সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতি বোঝা যায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ——পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নিয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সৎ কর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামতরাজির মূল্য হওয়া দূরের কথা। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বুখারী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না---আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। ---(মাযহারী)

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْٓ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ

الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

(২২) পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্য বলা হল, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না, কিন্তু তা (সবই) এক কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহফুযে) লিপিবদ্ধ থাকে প্রাণসমূহকে সৃষ্টি করার পূর্বেই (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিপদ পূর্ব-অবধারিত)। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ কাজ। (সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তিনি লিপিবদ্ধ করে দেন। কারণ, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। এটা এজন্য বলা হল) যাতে তোমরা যা হারাও (স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি অথবা ধনসম্পদ), তজ্জন্য (অতটুকু) দুঃখিত না হও, (যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণে ও পরকালের কাজে মশগুল হওয়ার পথে বাধা হয়ে যায়। নতুবা স্বাভাবিক দুঃখ করলে কোন ক্ষতি নেই) এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, (সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় দিয়েছেন মনে করে) তজ্জন্য উল্লসিত না হও (কারণ, যার ব্যক্তি অধিকার আছে, সে-ই উল্লসিত হতে পারে। এখানে তো আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় ও নির্দেশে দিয়েছেন। কাজেই উল্লসিত হওয়ার কোন অধিকার নেই)। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না; (অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর কারণে অহংকার অর্থে **اختيال** শব্দ এবং বাহ্যিক ধনসম্পদ, পদ ইত্যাদির কারণের অহংকার অর্থে প্রায়ই **فخر** শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর কৃপণতার নিন্দা করা হচ্ছেঃ) যারা (দুনিয়ার মোহে) নিজেরাও (আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় খাতে ব্যয় করতে) কৃপণতা করে (যদিও খেয়াল-খুশী ও পাপ কাজে ব্যয় করতে মুক্তহস্ত থাকে) এবং (এই পাপও করে যে) অপরকে কৃপণতার আদেশ দেয়। (**الَّذِيْنَ** ---ব্যাকরণিক কায়দায় **بدل** , কিন্তু এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, শাস্তির আদেশ সবগুলো কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বরং প্রত্যেকটি মন্দ স্বভাবের জন্য শাস্তির আদেশ উচ্চারিত হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার মোহ এমন যে, এর সাথে অধিকাংশ মন্দ স্বভাবের সমাবেশ ঘটেই যায়---অহংকার, গর্ব, কৃপণতা ইত্যাদি) যে ব্যক্তি (সত্য ধর্ম থেকে, যার এক শাখা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করে না। কারণ, তিনি (সকলের ইবাদত ও ধন-সম্পদ থেকে) অভাবমুক্ত, (এবং স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে) প্রশংসার্হ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফিল করে দেয়। এক. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দুই. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا —অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহ্‌ফুযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ —আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলা লওহে মাহ্‌ফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালমন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তাভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে।---(রূহুল-মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধনসম্পদের কারণে উদ্ধত ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ —অর্থাৎ আল্লাহ্ উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও

পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

(২৫) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নেবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (এই পরকাল সংশোধনের জন্য) আমার রসূলগণকে স্পষ্ট বিধানাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও (এতে বিশেষভাবে ন্যায়নীতি যা বান্দার হকের ব্যাপারে) ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (এতে স্বল্পতা ও বাহুল্য বর্জিত সমগ্র শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত আছে)। আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি (যাতে এর ভয়ে বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হয়ে যায়) এবং (এছাড়া) মানুষের বহুবিধ উপকার। (সেমতে অধিকাংশ যন্ত্রপাতি লৌহনির্মিত হয়ে থাকে। আরও এজন্য লৌহ সৃষ্টি করা হয়েছে) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেন কে (তাঁকে) না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) সাহায্য করে। (কেননা, লৌহ জিহাদেও কাজে আসে। এটা লোহার পারলৌকিক উপকার। জিহাদের নির্দেশ এজন্য নয় যে, তিনি এর মুখাপেক্ষী। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা (নিজে) শক্তিধর পরাক্রমশালী (বরং তোমাদের সওয়াবের জন্য এই নির্দেশ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঐশী কিতাব ও পয়গম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ -

بَيِّنَاتٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য মো'জেযা এবং রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে।---(ইবনে কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যত শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ بَيِّنَاتٌ বলে মো'জেযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্য কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীযান' নাযিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্য নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও 'মীযান'-এর অর্থে শামিল আছে; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদি পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বরগণ পর্যন্ত পেঁ ৗছা সুবিদিত। কিন্তু মীযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কুরতুবী বলেন: প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাক-পদ্ধতিতে এর নযীর বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ: اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ وَوَضَعْنَا الْمِيْزَانَ অর্থাৎ আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা আর-রহমানের وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে مِيزَان শব্দের সাথে وَضَعَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নূহ (আ)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাযিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল

করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না— পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহু পূর্বেই লওহে মাহ্ফুযে লিখিত ছিল---এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ ---(রূহুল মা'আনী)।

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আল্লাহ্র বিধান ও ন্যায়-নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। দুই. এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। 'মীযান' ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীযানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃত-পক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য নয় ; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ—রূহুল মা'আনীতে আছে, এখানে واو অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ; অর্থাৎ لِيَنْفَعَهُمْ—আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্য জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

(২৬) আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে

এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের পাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন, তোমাদেরকে দেবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহ্র সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (মানুষের এই পরকাল সংশোধনের জন্যই) নূহ ও ইবরাহীম (আ)-কে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদের বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি (অর্থাৎ তাদের বংশধরগণের মধ্যেও কতককে পয়গম্বর এবং কতককে কিতাবধারী করেছি)। অতঃপর (যাদের কাছে পয়গম্বরগণ আগমন করেছেন) তাদের কতক সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [উপরোক্ত পয়গম্বরগণ স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিতাবধারীও ছিলেন; যেমন নূহ ও ইবরাহীম (আ) উভয়ের বংশধরের মধ্যে মূসা (আ) কেউ কেউ কিতাবধারী ছিলেন না, কিন্তু তাদের শরীয়ত স্বতন্ত্র ছিল; যেমন হূদ ও সালেহ (আ) মোটকথা, স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছি]। অতঃপর তাদের পশ্চাতে আরও রসূলগণকে (যারা স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী ছিলেন না) একের পর এক প্রেরণ করেছি [যেমন মূসা (আ)-র পর তওরাতের বিধানাবলী প্রয়োগ করার জন্য অনেক পয়গম্বর আগমন করেন] এবং তাদের অনুগামী করেছি (একজন স্বতন্ত্র শরীয়তধারী পয়গম্বরকে; অর্থাৎ) মরিয়ম-তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। (তার উম্মতে দুই প্রকার লোক ছিল —তার অনুগামী ও তাকে প্রত্যাখ্যানকারী)। যারা অনুসরণ করেছিল (অর্থাৎ প্রথম প্রকার আমি তাদের অন্তরে (পারস্পরিক) স্নেহ ও মমতা (যা প্রশংসনীয় গুণ) সৃষ্টি করে দিয়েছি (যেমন সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ কিন্তু তাদের শরীয়তে জিহাদ ছিল না বলে এর বিপরীতে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ উল্লেখ করা হয়নি। মোটকথা স্নেহ-মমতাই তাদের মধ্যে প্রবল ছিল। আমি তাদেরকে কেবল বিধানাবলী

পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু অনুসারীদের কেউ কেউ এমন ছিল যে) তারা নিজেরাই সন্ন্যাসবাদ উদ্ভাবন করেছে। [বিবাহ এবং বৈধ ভোগ-বিলাস ও মেলামেশা ত্যাগ করাই ছিল তাদের সন্ন্যাসবাদের সারমর্ম। এটা উদ্ভাবনের কারণ ছিল এই যে, ঈসা (আ)-র পর যখন খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে থাকে, তখন কিছুসংখ্যক সত্যপরায়ণ লোক নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করত। এটা প্রবৃত্তিপূজারীদের সহ্য করার কথা ছিল না। তাই তারা বাদশাহ্‌র কাছে অনুরোধ করল যে, এদেরকে আমাদের মতাবলম্বী হতে বাধ্য করা হোক। অতঃপর সত্যপরায়ণ লোকদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং সবার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে অথবা ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।—(দুররে-মনসূর) এখানে তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সন্ন্যাসবাদ উদ্ভাবন করে]। আমি তাদের উপর এটা ফরয করিনি, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য (ধর্মের হিফাযতের জন্য) এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা (অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই)। তা (অর্থাৎ সন্ন্যাসবাদ) যথাযথভাবে পালন করেনি। [অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা এটা অবলম্বন করেছিল কিন্তু এই উদ্দেশ্যের প্রতি তেমন যত্নবান হয়নি এবং বিধানাবলী পালন করেনি— কেবল দৃশ্যত সন্ন্যাসবাদ প্রকাশ করেছে। এভাবে সন্ন্যাসীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। বিধানাবলী যথাযথ পালনকারী ও বিধানাবলীতে শৈথিল্যকারী। তাদের মধ্যে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমসাময়িক ছিল, তাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বিধানাবলী পালনের একটি শর্ত ছিল। তার বিধানাবলী পালন করেছে। আর যারা এই শর্ত পালন করেনি, তারা যথাযথভাবে বিধানাবলী পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি]। তাদের মধ্যে যারা [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি] বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের (প্রাপ্য) পুরস্কার দিয়েছি (কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম) এবং তাদের অধিকাংশ ছিল পাপাচারী। [তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। যেহেতু অধিকাংশই অবিশ্বাসী ছিল। তাই فَمَا رَعَوْهَا বাক্যে যথাযথ পালন না করার বিষয়টি সবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অল্পসংখ্যক যারা বিশ্বাসী ছিল, তাদের কথা আয়াতের শেষে فَاٰمَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খৃস্টানদের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুই শ্রেণীরই উল্লেখ করা হল। অতঃপর বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) হে [ঈসা (আ)-এ বিশ্বাসী] মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং (এই ভয়ের দাবী অনুযায়ী) তাঁর রসূল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি স্বীয় অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন (যেমন সূরা কাসাসে আছে, اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ এবং) তোমাদেরকে এমন জ্যোতি দেবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে। (অর্থাৎ এমন ঈমান দেবেন যা এখান থেকে পুলসিরাত পর্যন্ত সাথে থাকবে)। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা

করবেন। (কারণ, ইসলাম গ্রহণ করলে কাফির থাকাকালীন সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (এসব ধন তোমাদেরকে এজন্য দেবেন) যাতে (কিয়ামতের দিন) কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপর ও (রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত) তাদের কোন ক্ষমতা নেই; (এবং আরও জেনে নেয় যে) দয়া আল্লাহ্র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন (সেমতে তিনি মুসলমানদেরকে দান করেছেন)। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অহমিকা যেন চূর্ণ হয়ে যায়। তারা বর্তমান অবস্থাতেও নিজেদেরকে আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার পাত্র মনে করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হিদায়ত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মীযান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ)-র এবং পরে পয়গম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ নূহ (আ)-র সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে: ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا অর্থাৎ এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ)-র উল্লেখ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً —অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رحمت ও رافت শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন: رأفة এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন: কারও প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত

কারণ থাকে। এক. সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেওয়া। একে رافة বলা হয়। দুই. কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رحمت বলা হয়। মোটকথা رافة এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رحمت এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رافت-কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আ)-র সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رافت ও رحمت উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবায়ে কিরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাত্হ্-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

কিন্তু এর আগে সাহাবায়ে কিরামের আরও একটি বিশেষ গুণ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ও বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ তাঁরা কাফিরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, ঈসা (আ)-র শরীয়তে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফিরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোন স্থানই সেখানে ছিল না।

সন্ন্যাসবাদের অর্থ ও জরুরী ব্যাখ্যা ঃ وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوهَا—رهبانية শব্দটি رهبان এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। راهب ও رهبان-এর অর্থ যে ভয় করে।

হযরত ঈসা (আ)-র পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলিম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হল। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তাঁরা দেখলেন যে, মুকাবিলার শক্তি তাদের নেই; কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের ধর্মও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্য জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দেবেন, বিয়ে করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দেবেন, যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহ্র ভয়ে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন; তাই তাঁরা راهب অথবা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হত এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانيت তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করল।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হিফাযতের জন্য ছিল। তাই এটা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আল্লাহ্‌র জন্য নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেওয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণত মানত আসলে কারও উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে মানত করে নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ্‌ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং হাদিয়া ও নযর-নিয়ায আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে মানুষের ভীড় জমে উঠে। ফলে বেহায়াপনা ও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেওয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল---আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমত পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা)-র হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (রা) বলেনঃ বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আ)-র পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মুকাবিলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মুকাবিলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মুকাবিলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্ন্যাসবাদ প্রথমে

তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরীয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্ন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল তা যথাযথ পালন করেনি— فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

এ থেকে আরও জানা গেল যে, اِبْتَدَعُوْا শব্দটি بدعت থেকে উদ্ভূত হলেও এ স্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদ'আত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে كل بدعة ضلالة অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন ঃ

—وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেন ঃ আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্ন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্ন্যাসবাদও সত্তাগতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্ন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رهبانية শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رهبانية শব্দের আগে ابتدعوا বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি ; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্ন্যাসবাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও ابتداع শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কোরআন স্বয়ং এর বিরূপ সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদ'আতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদ'আতের অপরাধে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়---পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হত।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ : বিশুদ্ধ কথা এই যে, رهبانية শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। এক. কোন অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি। কোরআন পাকের يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

দুই. অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোন পার্থিব কিংবা ধারায় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোন রোগব্যাধির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন---যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণত মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে; কিংবা কোন কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করে তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসবাদ নয়; বরং তাক্ওয়া যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

তিন. কোন্ অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে لا رهبانية فى الاسلام অর্থাৎ ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্ন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হিফাযতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ——এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদী ও খৃস্টানদের বেলায় 'আহ্‌লে-কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-র প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা الَّذِينَ آمَنُوا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খৃস্টানদের জন্য الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সওয়াব হযরত মূসা (আ) অথবা ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরীয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় সওয়াব শেষ নবী (সা)-র প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফির ছিল এবং কাফির-দের কোন ইবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরীয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফির মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফির অবস্থায় কৃত সব সৎ কর্ম বহাল করে দেওয়া হয়। ফলে সে দুই সওয়াবের অধিকারী হয়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ এখানে لا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত বিধানাবলী এজন্য বর্ণনা করা হলো, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহ্‌র কৃপা লাভে সমর্থ হবে।